Education Watch 2015

# Moving from MDG to SDG

Accelerate Progress Quality Primary Education

সহযোগিতায়

সিভিল সোসাইটি এডুকেশন ফান্ড (সিএসইএফ)

এডুকেশন ওয়াচ ২০১৫

# সহস্রাব্দ উন্নয়ন থেকে টেকসই ভবিষ্যৎ

প্রয়োজন মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির গতিবৃদ্ধি

মূল প্রতিবেদনের সহজ ভাষ্য

প্রকাশনায়

গণসাক্ষরতা অভিযান

এডুকেশন ওয়াচ ২০১৫

# সহস্রাব্দ উন্নয়ন থেকে টেকসই ভবিষ্যৎ

প্রয়োজন মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির গতিবৃদ্ধি

মূল প্রতিবেদনের সহজ ভাষ্য


সম্পাদনা: শফি আহমেদ

**মূল প্রতিবেদন**

সমীর রঞ্জন নাথ, আহমেদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী
কাজী সালেহ আহমদ, মনজুর আহমদ



প্রকাশনা ও সমন্বয়ে
গণসাক্ষরতা অভিযান


এডুকেশন ওয়াচ সিরিজের ১৯৯৮-২০১৫ গবেষণা প্রতিবেদনের ধারাবাহিক বিশ্লেষণধর্মী তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।


এডুকেশন ওয়াচ প্রতিবেদন ২০১৫

## প্রকাশনায়

যোগাযোগ
গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭
ফোন: ৯১৩০৪২৭, ৫৮১৫৫০৩১-৩২, ৫৮১৫৩৪১৭
ফ্যাক্স: ৯১৩২৮৪২, ইমেইল: info@campebd.org
ওয়েবসাইট: www.campebd.org
: www.facebook.com/campebd
: www.twitter.com/campebd

## প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ২০১৬



প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত



## ছবি

- মোঃ শফিকুল ইসলাম কিরণ
- ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন

**আইএসবিএন :** ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-১৬৮৫-৮

## প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ:

**সৃষ্টি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং,** ৩/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

## মুখবন্ধ

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উদ্যোগে ১৯৯৯ সালের শুরুর দিকে শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যাপৃত কয়েকটি সংগঠন ও উদ্যমী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় 'এডুকেশন ওয়াচ' নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই উদ্যোগের সার্বিক উদ্দেশ্য হল শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষত মৌলিক শিক্ষার বিভিন্ন পরিসরে কতটুকু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তা জনসাধারণ, সরকার, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসহ অভীষ্ঠজনদের নিকট উপস্থাপন করা।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংগঠন ও নাগরিকবৃন্দের উদ্যোগে ১৯৯৬ সালে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ওপর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে প্রণীত সুপারিশমালার অন্যতম ছিল দেশে সাক্ষরতা ও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি, গুণগত মান ও বিরাজমান অবস্থা সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই গণসাক্ষরতা অভিযান ১৯৯৮ সালের গোড়ার দিকে 'এডুকেশন ওয়াচ' কর্মসূচি গ্রহণ করে। দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ, গবেষক, সরকারি প্রতিনিধি, একাডেমিশিয়ান ও এনজিও প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠিত হয়। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের তত্ত্বাবধানে ১৯৯৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৪টি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, যা দেশে ও বিদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গণসাক্ষরতা অভিযান জন্মলগ্ন থেকেই এই কর্মসূচির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে আসছে।

এডুকেশন ওয়াচ ২০১৫ বাংলাদেশের 'মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার' গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রণীত হয়েছে। এডুকেশন ওয়াচ- এর সূচনাকাল ১৯৯৮ সাল থেকেই প্রাথমিক শিক্ষার মান সম্পর্কে বেশকিছু গবেষণা হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রাথমিক শিক্ষার মানকে গবেষণার মূল বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ গবেষণায় ১৯৯৮ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত পরিচালিত বিভিন্ন এডুকেশন ওয়াচ গবেষণার তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। সবার জন্য শিক্ষা ২০১৫ এর অসমাপ্ত কাজ এবং ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এ গবেষণাটিকে গত ১৫ বছরের প্রচেষ্টার একটি সামষ্টিক মূল্যয়ন হিসেবে বিবেচনা করা যায়। একই সঙ্গে এটি আগামী ১৫ বছরের কর্মকাণ্ডের একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি'র তৃতীয় পর্যায় (২০১১-১৬) শিক্ষার সম্প্রসারণের পাশাপাশি মান উন্নয়নের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করছে। শিক্ষার মান কোনো স্থির বা নিশ্চল ধারণা নয়। জাতীয় রূপকল্প তথা দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে এর সংজ্ঞাও পরিবর্তিত হয়।

এডুকেশন ওয়াচ ২০১৫ প্রতিবেদনের আলোকে প্রণীত সহস্রাব্দ উন্নয়ন থেকে টেকসই ভবিষ্যৎ- প্রয়োজন মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির গতিবৃদ্ধি শীর্ষক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মানের সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির গতিবৃদ্ধিসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক এর উন্নয়নের গতিবৃদ্ধিতে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দিকনির্দেশনা ও কৌশল সংক্রান্ত কিছু সুপারিশ এ গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

এডুকেশন ওয়াচ-এর মূল প্রতিবেদনটি প্রণয়নে সমীর রঞ্জন নাথ, আহমেদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী, অধ্যাপক কাজী সালেহ্ আহমদ এবং ড. মনজুর আহমদ নেতৃত্ব দান করেছেন। সহজবোধ্য এ সংস্করণটি প্রণয়নে অধ্যাপক শফি আহমেদ বরাবরের মতো এবারও মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গবেষণাটির বিভিন্ন পর্যায়ের সকল অংশগ্রহণকারী বিশেষ করে খানাজরিপে যারা সম্পৃক্ত হয়েছিলেন তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্রিয় সহযোগিতা আমাদের গবেষকদলের কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

আশা করি, এ প্রকাশনা বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এবং এডভোকেসি কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ।

**রাশেদা কে. চৌধূরী**
নির্বাহী পরিচালক

# ভূমিকা

একটা তথ্য উল্লেখ করলে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপ্তিটা সহজেই বোঝা যাবে। আমাদের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীর সংখ্যা যত, পৃথিবীর অনেকগুলো দেশের মোট জনসংখ্যাও তত নয়। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা উন্নয়নে নানা সময় বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিশেষত ১৯৯০ সাল থেকে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯০ সালেই থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে শিক্ষা বিষয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শীর্ষ নেতাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল সে বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে ঘোষণাপত্রে বিশ্বনেতৃবৃন্দ স্বাক্ষর করেছিলেন। দশ বছর পর সেনেগালের রাজধানী ডাকারে আবারও মিলিত হয়েছিলেন বিভিন্ন দেশের সরকারের নেতৃবৃন্দ। এ সম্মেলনে লক্ষ্য পূরণের সময়টা পিছিয়ে গেলেও সবার জন্য শিক্ষা প্রাপ্তির সপক্ষে অঙ্গীকার পুনরায় ঘোষিত হয়েছিল। ওই ২০০০ সালেই আবার ঘোষিত হয়েছিল জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা। এমন সব কয়টি আন্তর্জাতিক উদ্যোগের প্রতি বাংলাদেশ তার অঙ্গীকারের কথা বারবার ব্যক্ত করেছে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সরকার যেমন নানরকম পদক্ষেপ নিয়েছে, তেমনি বেসরকারি সংস্থাগুলোও এ কাজে বেশ ব্যাপকভাবে এগিয়ে এসেছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

১. প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ;
২. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন (১৯৯০);
৩. বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা;
৪. উপবৃত্তি প্রদান এবং এর আওতা বাড়ানো;
৫. যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তন;
৬. শিক্ষক প্রশিক্ষণ জোরদার করা;
৭. বিনামূল্যে সকল পাঠ্যপুস্তক যথাসময়ে বিতরণ এবং
৮. দুর্গম এলাকা ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় স্থাপন।



প্রাথমিক শিক্ষাকে দেশের গরিব ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়াই হল মূললক্ষ্য। এ কাজে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তাও পাওয়া গেছে। তাদের সহযোগিতায় পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (Primary Education Development Programme-PEDP) তৃতীয় পর্যায় এখন চলছে। প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় সব শিশুদের নিয়ে আসা, ঝরে পড়া রোধ করা এবং তার মাধ্যমে সকলের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন এবং ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এ সকল কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় বেশ খানিকটা অগ্রগতি লক্ষ করা গেছে। আমাদের অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে প্রতিবেশী দেশসমূহ থেকে অনেকটা বেশি। আগের চেয়ে অনেক কম শিশু ঝরে পড়ছে। সরকার এ বিষয়ে তদারকি করছে, আবার মাতা-পিতা এবং অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট শিখনফল অর্জন এবং এই সূত্রে শিক্ষার মান নিশ্চিত করনের সমস্যাটা রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে আত্মতৃপ্তির কোনো অবকাশ নেই।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির তৃতীয় পর্যায় এখন চলছে। সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই পর্যায়ে সব শিক্ষার্থীকে শিক্ষার আওতায় আনা ছাড়াও শিক্ষার মান উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে এডুকেশন ওয়াচ গবেষক দল ২০১৫ সালে গবেষণার মূল বিষয় হিসেবে বেছে নেয় 'প্রাথমিক শিক্ষার মান'। এই দলের পক্ষ থেকে এর আগেও প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। বিষয় নির্বাচনে কয়েকটি সন্ধিক্ষণকে বিশেষভাবে গণ্য করা হয়। ২০১৫ সাল হল সবার জন্য শিক্ষা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের শেষ বছর (২০০০-২০১৫)। আবার একই সঙ্গে এই সাল হল আগামী পনেরো বছরের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের সূচনাকাল (২০১৬-২০৩০)। তাই প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য এই বছরটা খুবই মোক্ষম সময়। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘে টেকসই উন্নয়নের জন্য ১৭টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে চার নম্বর লক্ষ্যটি হল সবার জন্য একীভূত ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ। এই শিক্ষার মান ও গতিপ্রকৃতি নিয়ে সরকারি পর্যায়ে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয় তা দেখার বিষয়। আমাদের এই গবেষণার মাধ্যমে কিছু দিকনির্দেশনাও দেওয়া যেতে পারে।

## গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি

সবচেয়ে প্রথমে মনে রাখতে হবে, এই গবেষণায় সুনির্দিষ্টভাবে প্রাথমিক শিক্ষার মান বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে। একটা মৌলিক বিষয়কে গবেষণার কেন্দ্রে রাখা হয়েছে, তা হল, শিক্ষায় সবার অধিকার রয়েছে, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব, শহরবাসী-গ্রামবাসী, সমতলবাসী-পাহাড়ি, সবার। কাগজে কলমে অথবা আপ্তবাক্য হিসেবে বা সরকারি মন্ত্রীদের ভাষণে এই কথাটা বারবার বলা হলেও সবার জন্য সম-সুযোগ এখনো আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পৃথিবীর খুব কম জায়গায়ই তা হয়েছে। তবে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে এই সমতা প্রতিষ্ঠা করা খুব শক্ত কাজ নয়। এই কাজটা করতে হবে।

### এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ-

১. প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে জোগান ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিবিধ সূচক ব্যবহার করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান, প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যকার বিভিন্নতা এবং সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন অনুসন্ধান।

২. জেন্ডার, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ এবং মানসম্মত শিক্ষা প্রদানে নিজ নিজ ভূমিকার আলোকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বৃত্তান্ত যাচাই।

৩. প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর অংশগ্রহণের সুবিধা, অংশগ্রহণ এবং যোগ্যতা অর্জন পরিমাপ করার পাশাপাশি অংশগ্রহণ ও শিখনফলের সঙ্গে আর্থ-সামাজিক অবস্থার সম্পর্ক এবং বিভিন্ন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এতে কোনো প্রকার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কিনা, তা অনুসন্ধান।

৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা পরিমাপ এবং প্রাথমিক শিক্ষায় বিনিয়োগের ফলাফল হিসেবে জনসাধারণের শিক্ষা ও সাক্ষরতার অবস্থায় কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে তার মূল্যায়ন।

৫. শিক্ষার্থীর জেন্ডার, এলাকা, বিদ্যালয়ের ধরন ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে সকলের সমান অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে মৌলিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জোগান, প্রক্রিয়া এবং ফলাফল বিশ্লেষণ।



এ গবেষণায় শিক্ষার মান বোঝার জন্য বহুল ব্যবহৃত জোগান-প্রক্রিয়া-তাৎক্ষণিক ফল মডেল ব্যবহার করা হয়েছে। এডুকেশন ওয়াচ-এর গবেষণায় এর আগেও এই মডেল ব্যবহার করা হয়েছিল। একই মডেল ব্যবহার করার ফলে আগের গবেষণাসমূহের ফলাফলের সঙ্গে এ গবেষণার ফলাফল তুলনা করা সহজ হয়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন সূচকে পরিবর্তনের ঝোঁকগুলো বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে, যা শিক্ষার উন্নয়ন মূল্যায়নের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ গবেষণায় শিক্ষার মান যাচাই করার জন্য প্রয়োজনীয় সূচক নির্ধারণ করতে গিয়ে যেসব তত্ত্ব নিয়ে নানা সময়ে আলোচনা হয়, সেগুলো পর্যালোচনার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তৈরি ও ব্যবহৃত দুই সেট সূচক ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলো হলো: মুখ্য দক্ষতা সূচক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় মানের স্তর। সূচক নির্ধারণে নিচের বিষয়গুলো গ্রহণ করা হয়েছে।

**জোগান সম্পর্কিত সূচক:** এর মধ্যে রয়েছে বিদ্যালয় অবকাঠামো, বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশ, পরিচ্ছন্নতা, শ্রেণিকক্ষের সুযোগ-সুবিধা, শ্রেণিকক্ষে কতজন বসতে পারে, শিক্ষকদের বসার ব্যবস্থা, শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পানীয় জল ও শৌচাগার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার, ব্ল্যাকবোর্ডের মান, শিক্ষার্থী ভর্তি এবং শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তথ্য।

**প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সূচক:** এর অন্তর্ভুক্ত হল শিক্ষার্থীর উপস্থিতি, শিক্ষকের উপস্থিতি, শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত, বিদ্যালয় প্রারম্ভকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সকল শিক্ষার্থীর জাতীয় সংগীত পরিবেশন, বিদ্যালয়ের ইউনিফর্ম, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, ক্রীড়া এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলোচিত বিভিন্ন বিষয়।

**তাৎক্ষণিক ফলসংক্রান্ত সূচক:** এর মধ্যে আছে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত টিকে থাকা শিক্ষার্থীদের অনুপাত, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকরণ, শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ দক্ষতার মান, শিক্ষার্থীদের অর্জিত যোগ্যতা এবং স্থানীয় জনসাধারণের শিক্ষা অর্জনের স্তর ও তাদের সাক্ষরতার অবস্থা।

## মানসম্মত শিক্ষা বিশ্লেষণের ফ্রেমওয়ার্ক

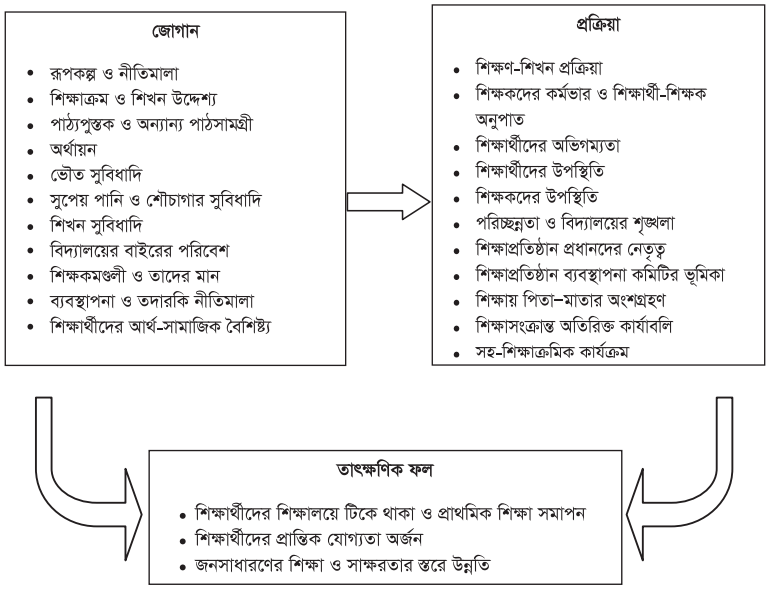




এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আগের গবেষণাগুলোর সঙ্গে তুলনাযোগ্য তথ্যের অভাবে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন- শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া এ গবেষণায় বিবেচনা করা হয়নি।

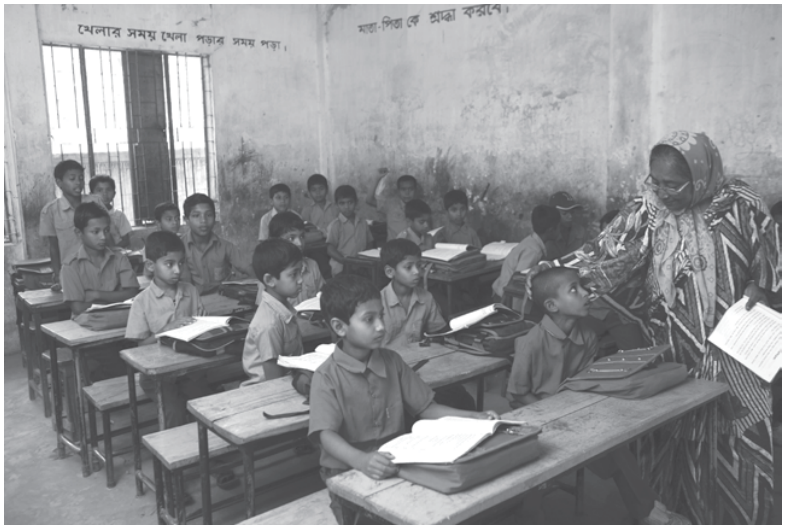


এ গবেষণায় ১৯৯৮ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত পরিচালিত বিভিন্ন এডুকেশন ওয়াচ গবেষণার তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। শিক্ষার মান নিরূপণকারী সকল তথ্য-উপাত্ত ও সূচক এই গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যবহৃত তথ্য উপাত্ত হল:

- এডুকেশন ওয়াচ খানাজরিপ ১৯৯৮, ২০০০, ২০০৫, ২০০৮ ও ২০১৩
- এডুকেশন ওয়াচ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জরিপ ১৯৯৮, ২০০০, ২০০৮ ও ২০১৪
- এডুকেশন ওয়াচ যোগ্যতাভিত্তিক শিখনফল অর্জন অভীক্ষা ২০০০, ২০০৮ ও ২০১৪

একেক বছর একেক সংখ্যক ধারা বিবেচনা করা হয়েছিল খানাজরিপের বেলায়, প্রশ্নের ধরন ও নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধরনও ভিন্ন ছিল।

উল্লেখ করা যায় যে, প্রথম চার বছরের খানাজরিপে বিভাগভিত্তিক নমুনা একত্র করা হয়েছিল কিন্তু পঞ্চমটিতে এসে সমগ্র দেশে জাতীয় ভিত্তিতে একটি নমুনা নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ ও শিখনফল যাচাই অভীক্ষা ২০০০ সালে তিন ধরনের, ২০০৮ সালে ছয় ধরনের এবং ২০১৪ সালে পাঁচ ধরনের বিদ্যালয়ের ওপর পরিচালনা করা হয়েছিল। অবশ্য প্রতিটিতেই সরকারি, নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। খানাজরিপে ১৯৯৮ সালে ৪২,৫৪৮টি, ২০০০ সালে ৩০,০৫১টি, ২০০৫ সালে ২৩,৯৭১টি, ২০০৮ সালে ২৪,০০৭টি ও ২০১৩ সালে ৯,০০০টি খানা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জরিপের ক্ষেত্রে ১৯৯৮ সালে ৮৮৫টি, ২০০০ সালে ৯৫২টি, ২০০৮ সালে ৪৪০টি ও ২০১৪ সালে ৬৬৩টি বিদ্যালয়ে জরিপকাজ পরিচালনা করা হয়।

২০০০ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিখনফল যাচাই অভীক্ষা পরিচালনা করা হয়, ১৮৬টি বিদ্যালয়ের ২,৫০৯ জন শিক্ষার্থী, ২০০৮ সালে ৪৪০টি বিদ্যালয়ের ৭,০৯৩ জন শিক্ষার্থী ও ২০১৪ সালে ৩০৯টি বিদ্যালয়ের ৫,৩৭৫ জন শিক্ষার্থীর ওপর।

## এক নজরে গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন জরিপের নমুনা

| উপাত্তের উৎস | সাল | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১৯৯৮ | ২০০০ | ২০০৫ | ২০০৮ | ২০১৩ | ২০১৪ |
| খানা সংখ্যা | ৪২,৫৪৮ | ৩০,০৫১ | ২৩,৯৭১ | ২৪,০০৭ | ৯,০০০ | - |
| শিশু (৬-১০ বছর) | ৩১,০৯২ | ২০,৬৮৬ | ১৫,৭৩৬ | ১৪,৬৮৮ | ৪,৯৪৫ | - |
| প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী | ৩৩,২২৯ | ২২,২৩৯ | ১৬,০০০ | ১৫,১৮৯ | ৫,১৪৭ | - |
| মোট জনসংখ্যা | ২১৪,৫৪৫ | ১৫০,০২৮ | ১২২,০০৬ | ১১৩,৩২০ | ৪০,৭০২ | - |
| শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জরিপ | | | | | | |
| শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | ৮৮৫ | ৯৫২ | - | ৪৪০ | - | ৬৬৩ |
| প্রান্তিক যোগ্যতা পরিমাপক অভীক্ষা | | | | | | |
| শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | - | ১৮৬ | - | ৪৪০ | - | ৩০৯ |
| শিক্ষার্থী সংখ্যা | - | ২,৫০৯ | - | ৭,০৯৩ | - | ৫,৩৭৫ |

## গবেষণার ফলাফল

### প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো

বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা শিক্ষার সার্বিক মান যাচাইয়ের জন্য জোগান সম্পর্কিত সূচক গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর মধ্যে কিছু মৌলিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন–বিদ্যালয় ভবন, শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষকদের কক্ষ, সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত ব্ল্যাকবোর্ড, খাবার পানি ও শৌচাগার, বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এবং সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রম।

### সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী (২০১৪ সালে)

- বেশির ভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ি মাদ্রাসা নিজস্ব জায়গায় ভবন তৈরি করেছে।

- বেশির ভাগ কিন্ডারগার্টেন ও প্রায় সব উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে ভাড়ায় বা বিনা ভাড়ায় অন্যের কাছ থেকে ঘর নিয়ে।
- সাঁইত্রিশ শতাংশ কিন্ডারগার্টেন নিজস্ব জমিতে আর ১২ শতাংশ অন্যের কাছ থেকে জমি ধার করে ভবন তৈরি করেছে।
- বিদ্যালয় ভবনে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের চলাচলে সহায়তা করতে ঢালু সিঁড়ি নির্মাণে অন্যসব ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে এগিয়ে আছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
- প্রায় ৮৫ শতাংশ সরকারি ও নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ আছে।
- অধিকাংশ কিন্ডারগার্টেন ও উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে খেলার মাঠের ব্যবস্থা নেই।
- বিদ্যুৎ সংযোগ সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে কিন্ডারগার্টেনে (৮৪.৭ শতাংশ), এরপরই আছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থান (৫৬ শতাংশ)।
- কোনো ধরনের বিদ্যালয়ের আঙ্গিনাতেই ফুলের বাগান তেমন একটা দেখা যায়নি।

সার্বিকভাবে, ৬০.৮ শতাংশ বিদ্যালয় নিজস্ব জমিতে অবস্থিত, ৬৩.৫ শতাংশ নিজস্ব ভবন আছে, ১৭.৮ শতাংশ ঢালু সিঁড়ি তৈরি করেছে, বিদ্যুৎ সংযোগ আছে ৪১.৮ শতাংশ, খেলার মাঠ আছে ৫৭ শতাংশে এবং মাত্র ৭.৫ শতাংশ বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় ফুলের বাগান আছে। নিজস্ব জমি ও ভবন, ভবন সংলগ্ন ঢালু সিঁড়ি ও খেলার মাঠের ক্ষেত্রে গ্রামীণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ শহরের তুলনায় এগিয়ে আছে। অন্যদিকে বিদ্যুৎ সংযোগ ও আঙ্গিনায় ফুলের বাগানের ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ।

দুই-তৃতীয়াংশ বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ ও বারান্দার দেয়াল এবং ৫৮.৮ শতাংশ বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ ও বারান্দার মেঝে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাওয়া গেছে। **শ্রেণিকক্ষের মেঝে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন** রাখার ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়। শ্রেণিকক্ষের দেয়াল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে একইরকম দক্ষতা দেখা গেছে কিন্ডারগার্টেন ও **উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে,** এরপরেই আছে **সরকারি প্রাথমিক ও নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়**। শ্রেণিকক্ষের দেয়াল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে শহরের বিদ্যালয়গুলো গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলোর তুলনায় এগিয়ে থাকলেও মেঝে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে উভয় স্থানে একইরকম চিত্র পাওয়া গেছে। **উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিদ্যালয়ের ভবন** পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে ২০০৮ সালের আগে যতটা অগ্রগতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল,পরবর্তী বছরগুলিতে এক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে।

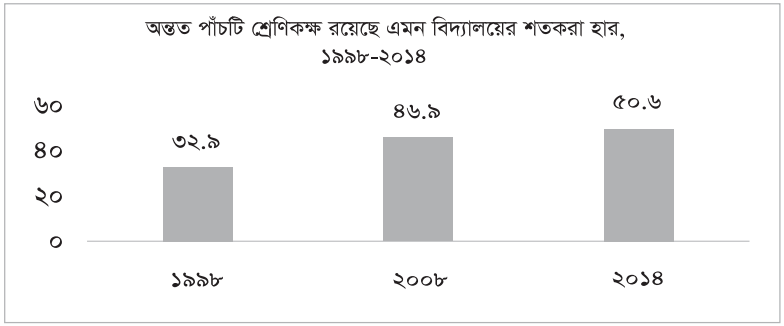


সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জরিপ ১৯৯৮, ২০০৮, ২০১৪

২০১৪ সালে এক কক্ষবিশিষ্ট উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় যেগুলো পাওয়া গিয়েছিল সেগুলোতে গড়ে ৩.৭টি শ্রেণিকক্ষ পাওয়া গেছে। উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলোকে বাদ দিলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪.৮টি। আলাদাভাবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড়ে ৪.৯টি শ্রেণিকক্ষ রয়েছে আর নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কক্ষ সংখ্যা ৩.৪টি। মাত্র ৮.১ শতাংশ বিদ্যালয়ে ৫০৭ বর্গফুট আয়তনের শ্রেণিকক্ষ আছে। শ্রেণিকক্ষের সংখ্যার দিক থেকে অন্যদের তুলনায় কিন্ডারগার্টেন এগিয়ে থাকলেও অন্যান্য ভৌত সুযোগ-সুবিধার সূচক বিবেচনায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সবার থেকে ভালো।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেনের বেশির ভাগ শ্রেণিকক্ষ পুরোপুরি ইট অথবা ইট ও টিনের সংমিশ্রণে তৈরি। এরূপ শ্রেণিকক্ষ আছে অর্ধেকেরও কম সংখ্যক এবতেদায়ী মাদ্রাসায় এবং তিন ভাগের এক ভাগ উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে। গড়ে অর্ধেকেরও কম সংখ্যক শ্রেণিকক্ষে বৈদ্যুতিক বাতি ও পাখার ব্যবস্থা আছে। গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলোর তুলনায় শহরের বিদ্যালয়গুলো বেশি সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন। স্কুল ভবনগুলোর নির্মাণসামগ্রীর মান, বৈদ্যুতিক বাতি ও পাখা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবেচনায় ২০০৮ থেকে ২০১৪ সালে স্পষ্টতই উন্নতি ঘটেছে। তবে অন্য ধরনের বিদ্যালয়ের তুলনায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নতি বেশি মাত্রায় চোখে পড়েছে।

সময়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের আয়তনও বৃদ্ধি পেয়েছে, অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীর বসার ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৯৮ সালে একটি শ্রেণিকক্ষে ৩২ জন শিক্ষার্থী স্বাভাবিকভাবে বসতে পারত, যা বেড়ে ২০০৮ সালে দাঁড়িয়েছে ৩৭ জনে এবং ২০১৪ সালে ৩৯.৬ জনে। সরকারি প্রাথমিক ও নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের ধারণক্ষমতা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কিন্ডারগার্টেনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় কাছাকাছি, কিন্তু অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে। **২০১৪ সালে** কিন্ডারগার্টেন ও উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের ধারণক্ষমতা শিক্ষার্থী সংখ্যার চেয়ে বেশি থাকলেও অন্য তিন ধরনের বিদ্যালয়ে তা প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল।

২০০৮ থেকে ২০১৪ সময়কালে খাবার পানি ও শৌচাগার ব্যবস্থায়ও উন্নতি ঘটেছে। এক সময় বেশির ভাগ বিদ্যালয় বাইরে থেকে পানি এনে কোনো পাত্রে জমিয়ে রাখত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য। এখন তারা নিজ বিদ্যালয়ের আঙ্গিনাতেই খাবার পানি পায়। ১৯৯৮ সালে অর্ধেকেরও কম সংখ্যক বিদ্যালয়ের (৪৭ শতাংশ) আঙ্গিনায় খাবার পানির ব্যবস্থা ছিল, যা ২০১৪ সালে বেড়ে ৭৩.৭ শতাংশ হয়েছে। সার্বিকভাবে ৭৮.২ শতাংশ বিদ্যালয়ের খাবার পানিতে আর্সেনিক নাই বলে মতামত পাওয়া গেছে।

১৯৯৮ সালে তিন ভাগের দুই ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শৌচাগারের ব্যবস্থা ছিল, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮ সালে ৭০.৪ শতাংশ ও ২০১৪ সালে ৮৮.৫ শতাংশ-এ পৌঁছায়। শৌচাগারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই উন্নতি লক্ষ করা গেছে। ১৯৯৮ সালে ১০ শতাংশেরও কম বিদ্যালয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শৌচাগার ছিল, যা ২০১৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৬২.১ শতাংশ-এ দাঁড়িয়েছে। বেশির ভাগ বিদ্যালয়েই (৬৪.২ শতাংশ) ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য একই শৌচাগার আছে। ছেলে ও মেয়ের জন্য পৃথক শৌচাগার আনুপাতিক হারে বেশি আছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (৪২ শতাংশ), তারপরেই যৌথভাবে আছে নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেনে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শৌচাগারের ক্ষেত্রে শহরের বিদ্যালয়গুলো গ্রাম থেকে এগিয়ে আছে।

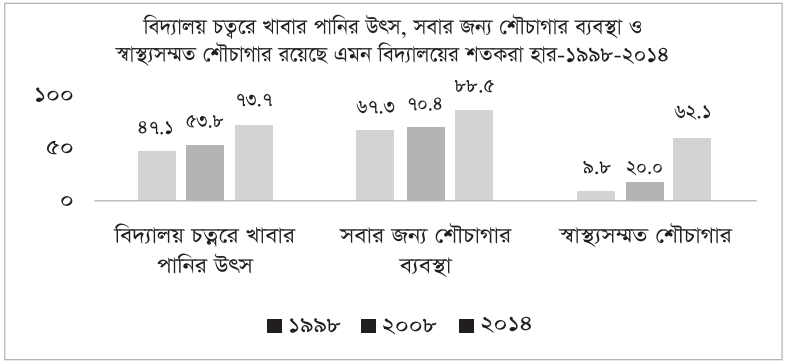


সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জরিপ ১৯৯৮, ২০০৮, ২০১৪

২০০৮ সালে মাত্র দুই শতাংশ বিদ্যালয়ে পাঠাগার ছিল, যা বেড়ে ২০১৪ সালে ১২.৬ শতাংশ পৌঁছেছে। মাত্র ১.৩ শতাংশ বিদ্যালয়ে পাঠাগারের জন্য আলাদা কক্ষ আছে। অন্যান্য বিদ্যালয়ে পাঠাগারের বই থাকে প্রধান শিক্ষক অথবা সহকারী শিক্ষকদের বসার কক্ষে। ধরন অনুযায়ী ১৮ শতাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৬.৭ শতাংশ কিন্ডারগার্টেন, ১৩.৩ শতাংশ নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠাগার আছে। ২০১৪ সালে ৮৬ শতাংশ শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার উপযোগী ব্ল্যাকবোর্ড পাওয়া গেছে, যা ২০০৮ সালে ছিল ৭৯.৬ শতাংশ। এসব ক্ষেত্রেও শহর এলাকা এগিয়ে আছে।

বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত গাওয়ার ক্ষেত্রেও উন্নতি লক্ষ করা গেছে। ২০১৪ সালে জরিপের দিনে ৯০ শতাংশ বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল এবং ৭৭ শতাংশ বিদ্যালয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়েছিল; এই হারসমূহ ২০০৮ সালের তুলনায় নিঃসন্দেহে অনেক বেশি। বেশির ভাগ (৯৫ শতাংশ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেনে এই নিয়ম বিদ্যমান। উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় (৭২.৭ শতাংশ) এবং এবতেদায়ি মাদ্রাসা (৮১.৩ শতাংশ) এ ক্ষেত্রে বেশ পিছিয়ে, এসব স্কুলের শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনায় পর্ষদের উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে।

এই গবেষণায় প্রাত্যহিক শরীর চর্চা, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও কাব কার্যক্রমকে সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রম হিসেবে ধরা হয়েছে। ২০১৪ সালের জরিপে বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে ব্যাপক ভিন্নতা লক্ষ করা গেছে, যা ৩০ শতাংশ থেকে ৫৯ শতাংশ। পাঠ্যসূচির চাপ ও পরীক্ষার জন্য সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রম দিন দিন অবহেলিত হচ্ছে।

## প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক

বিদ্যালয়ের ধরনভেদে শিক্ষকদের সংখ্যায় যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা গেছে। একই ধরনের বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য বিদ্যমান। একজন শিক্ষক বিশিষ্ট উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলো ব্যতীত ৪১.৩ শতাংশ বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষক সংখ্যা চার জন বা তার কম, ১১.৭ শতাংশ বিদ্যালয়ে ৫ জন, ১৭.৯ শতাংশ বিদ্যালয়ে ৬-৮ জন এবং ২৯ শতাংশ বিদ্যালয়ে নয় বা তার অধিক সংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন। বিদ্যালয়গুলোতে গড়ে শিক্ষক ছিলেন ৬.২ জন। গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলোতে গড় শিক্ষক সংখ্যা ৫.৫ জন আর শহরের বিদ্যালয়গুলোতে ৯.৬ জন।

কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং সর্বনিম্ন নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সময়ের সঙ্গে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংখ্যাও বেড়েছে– ১৯৯৮ সালে গড়ে যেখানে বিদ্যালয়প্রতি ৪.৯ জন শিক্ষক ছিলেন, ২০১৪ সালে তা ৬.২ জনে উন্নীত হয়েছে। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ ধরনের উন্নতি সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এবতেদায়ি মাদ্রাসার ক্ষেত্রে শিক্ষক সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। বিদ্যালয়সমূহে নারী শিক্ষকদের অনুপাত ক্রমশ বেড়েছে। ১৯৯৮ সালে মোট শিক্ষকদের ৩২ শতাংশ ছিলেন নারী, ২০০৮ সালে তা ৩৯.৩ শতাংশ ও ২০১৪ সালে ৬৩.৪ শতাংশ-এ উন্নীত হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতিটি জরিপ বছরেই বিদ্যালয়ের ধরনভেদে নারী শিক্ষকদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। নারী শিক্ষকদের হার গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলোর তুলনায় শহরের বিদ্যালয়গুলোতে সবসময় বেশি ছিল।

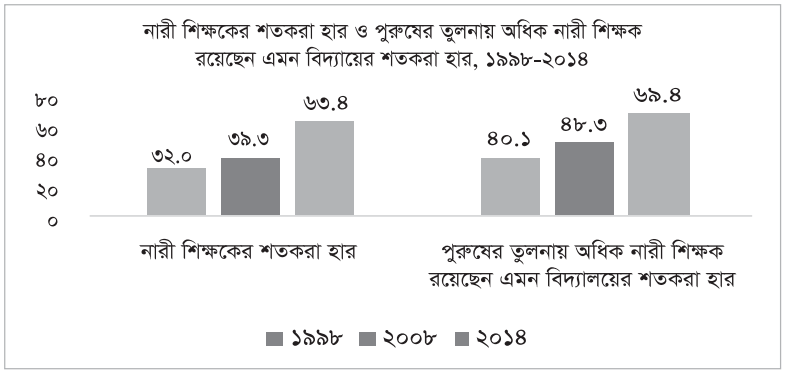


সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জরিপ ১৯৯৮, ২০০৮, ২০১৪

পুরুষের তুলনায় নারী শিক্ষক বেশি রয়েছে এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হারও পর্যায়ক্রমে বেড়েছে। ১৯৯৮ সালে দুই-পঞ্চমাংশ বিদ্যালয়ে পুরুষের তুলনায় নারী শিক্ষক বেশি ছিল, যা ২০১৪ সালে ৬৯.৪ শতাংশ উপনীত হয়েছে। সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে এই হার ১৯৯৮ সালে ২৯ শতাংশ থেকে ২০১৪ সালে ৭২.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবতেদায়ি মাদ্রাসার ক্ষেত্রে এ হার এখনো ১০ শতাংশ-এর নিচে। উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলোতে নারী শিক্ষকরা পড়িয়ে থাকেন।

সকল ধরনের বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বেড়েছে। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে এমন শিক্ষক এখন আগের চেয়ে বেশি। ১৯৯৮ সালে যেখানে ৪৮.৩ শতাংশ শিক্ষকের ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি ছিল তা বেড়ে ২০০৮ সালে ৫০.১ শতাংশ ও ২০১৪ সালে ৫৭.২ শতাংশ-এ উপনীত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ হার লক্ষ করা গেছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (৬৬.৯ শতাংশ), যার পরেই রয়েছে কিন্ডারগার্টেন (৫৬.৫ শতাংশ) ও নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় (২৬.১ শতাংশ)। উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এ হার ছিল মাত্র ৮ শতাংশ। এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেশিরভাগই (৫৮.২ শতাংশ) মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৮ সালে ৬০ শতাংশ-এরও কম শিক্ষকের মৌলিক প্রশিক্ষণ (সি-ইন-এড, বিএড, এমএড, ডিপ-ইন-এড, এনজিও কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ) ছিল, যা ২০০৮ ও ২০১৪ সালে যথাক্রমে ৬১.৩ শতাংশ ও ৬৫.৯ শতাংশ-এ উন্নীত হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ৯৪ শতাংশ, নতুন জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ৮৭.৮ শতাংশ ও উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের ৬০ শতাংশ-এরও কম শিক্ষক মৌলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের গুরুতর ঘাটতি লক্ষ করা গেছে কিন্ডারগার্টেন ও এবতেদায়ি মাদ্রাসায়, যা যথাক্রমে ১৫ শতাংশ ও ৭ শতাংশ। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ রয়েছে এমন শিক্ষকদের অনুপাতও ২০০৮ সাল থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে অনেক বেড়েছে।

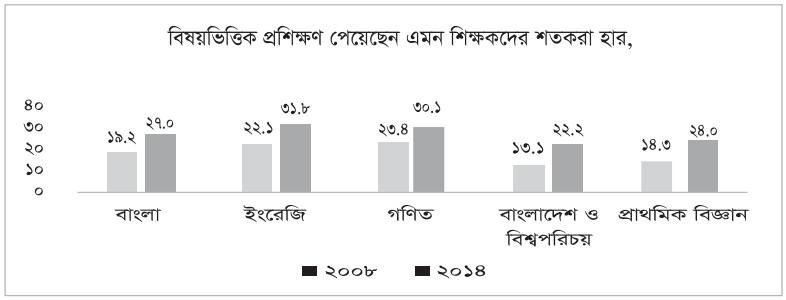


সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জরিপ ২০০৮, ২০১৪

বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের উপস্থিতির হার ২০০৮ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে বেড়েছে। ২০০৮ সালে জরিপের দিন শিক্ষকদের উপস্থিতির হার ছিল ৮৮.৪ শতাংশ, এদের মধ্যে ৫৭.৫ শতাংশ যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন অর্থাৎ তারা, বিদ্যালয় শুরুর সময়ের আগেই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। ২০১৪ সালে শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার ছিল ৮৯.৩ শতাংশ আর যথাসময়ে উপস্থিতির হার ছিল ৬৬.১ শতাংশ। উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় অন্যদের তুলনায় উভয়ক্ষেত্রেই এগিয়ে রয়েছে; যার পরপরই রয়েছে কিন্ডারগার্টেন। সর্বনিম্ন উপস্থিতির হার লক্ষ করা গেছে এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের ক্ষেত্রে। দেরিতে উপস্থিতি বেশি লক্ষ করা গেছে সরকারি ও নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাধ্যে। দেরিতে বিদ্যালয়ে আসা শিক্ষকদের গড় বিলম্ব ৩১ মিনিট।

শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত এখনো একটি বড় সমস্যা। এ অনুপাত ১৯৯৮ সালে ছিল ৪৬, যা কমে ২০০৮ সালে ৩৯ হয়েছে আবার তা বেড়ে ২০১৪ সালে ৪৩-এ পৌঁছেছে। শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত সবচেয়ে বেশি কমেছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে–১৯৯৮ সালের ৭৩ থেকে ২০১৪ সালে ৫২। ১৯৯৮ সালে অর্ধেকেরও কম বিদ্যালয়ে (৪৭.৩ শতাংশ) শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ছিল ৪০ঃ১ বা তার কম। ২০০৮ ও ২০১৪ সালে যা যথাক্রমে ৫৪.৫ শতাংশ ও ৫৮.৫ শতাংশ দেখা গেছে।

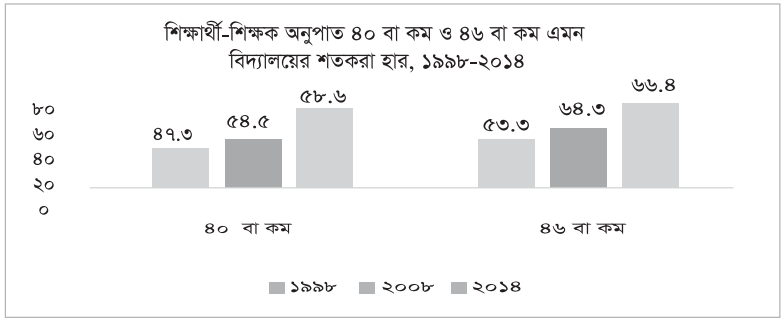


সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জরিপ ১৯৯৮, ২০০৮, ২০১৪

## প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা

বেশির ভাগ সরকারি ও নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এবতেদায়ি মাদ্রাসায় ২০১৪ সালে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ছিল। অপর দিকে, ১৫ শতাংশ উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় ও ২২.৫ শতাংশ কিন্ডারগার্টেনে এরূপ কোনো কমিটি ছিল না। সার্বিকভাবে, ৯১.৫ শতাংশ বিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি ছিল। বিদ্যালয়ের ধরনভেদে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সংখ্যায় ভিন্নতা দেখা গেছে। এ সংক্রান্ত বিধিবিধানেই ত্রুটি আছে। **কিন্ডারগার্টেনের ক্ষেত্রে এরূপ কোনো বিধিবিধান নেই।**

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে নারীদের হার ২০১৪ সালে ছিল ৪১.৩ শতাংশ। বিদ্যালয়ের ধরন ও এলাকাভেদে এ ক্ষেত্রে ভিন্নতা লক্ষ করা গেছে। নারী সদস্যের অনুপাত সবচেয়ে বে শি পরিলক্ষিত হয়েছে উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে (৬৬.২ শতাংশ) এবং কম পরিলক্ষিত হয়েছে এবতেদায়ি মাদ্রাসায় (৪ শতাংশ)। শহরের তুলনায় গ্রামীণ এলাকার বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোতে নারী সদস্যদের হার বেশি লক্ষ করা গেছে (যথাক্রমে ৩৭.১ শতাংশ ও ৪১.৮ শতাংশ)। ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী সদস্যদের হার এবং পুরুষদের তুলনায় নারী সদস্য বেশি রয়েছে এমন কমিটির হারও বেড়েছে। ১৯৯৮ সালে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী সদস্যদের হার ছিল এক-পঞ্চমাংশের নিচে, যা ২০১৪ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১.৩ শতাংশ। আবার, ১৯৯৮ সালে ১৪.৩ শতাংশ কমিটিতে পুরুষদের তুলনায় নারী সদস্য বেশি ছিল, তা বেড়ে ২০১৪ সালে ২৮.৭ শতাংশ উপনীত হয়েছে। অন্যান্য বিদ্যালয়ের তুলনায় সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে বৃদ্ধির প্রবণতা বেশি।

বিদ্যালয় পরিচালনায় প্রধান শিক্ষক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ২০১৪ সালের জরিপে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই (৯৬.৮ শতাংশ) প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে, ৩০.৪ শতাংশ ছিলেন নারী; এই হার গ্রামীণ বিদ্যালয়ে ৩১ শতাংশ আর শহরের বিদ্যালয়ে ৩৪.৪ শতাংশ, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই হার ছিল সর্বোচ্চ (৪৪.৫ শতাংশ) আর মাদ্রাসায় সর্বনিম্ন (২.৮ শতাংশ)। সময়ের সঙ্গে নারী প্রধান শিক্ষকের অনুপাত বেড়েছে– ১৯৯৮ সালে ১৩.৮ শতাংশ থেকে ২০০৮ সালে ২১.৬ শতাংশ ও ২০১৪ সালে ৩০.৪ শতাংশ। নারী প্রধান শিক্ষক বৃদ্ধির দিক থেকে সরকারি বিদ্যালয় অন্য ধরনের বিদ্যালয়ের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে।

সময়ের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতায়ও পরিবর্তন এসেছে। ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রিধারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন ১৯৯৮ সালে ৪৫.৪ শতাংশ, যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে ২০০৮ সালে ৬৯.৯ শতাংশ ও ২০১৪ সালে ৭৪.১ শতাংশ হয়েছে। ২০১৪ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯০ শতাংশ-এর বেশি ও নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৯.৯ শতাংশ-এর প্রধান শিক্ষকের ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি ছিল। কিন্ডারগার্টেন প্রধানদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ৮৭.৪ শতাংশ।



২০১৪ সালে শতকরা ৮৪ ভাগের বেশি প্রধান শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন; এর মধ্যে নারী ৮৮.৫ শতাংশ ও পুরুষ ৮২.২ শতাংশ। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল প্রধান শিক্ষক, নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯৫.৮ শতাংশ, কিন্ডারগার্টেনের ৩৪.৮ শতাংশ ও এবতেদায়ি মাদ্রাসার ১৮.৩ শতাংশ প্রধান শিক্ষক প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের অনুপাতও সময়ের সাথে বেড়েছে– ১৯৯৮ সালে ৭০.৮ শতাংশ থেকে ২০০৮ সালে ৭৭ শতাংশ ও ২০১৪ সালে ৮৪.২ শতাংশ।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় প্রায়শই যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে সেগুলো হলো– শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি, বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও মডেল পরীক্ষা, শিক্ষার মান ইত্যাদি। আলোচিত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ২০০৮ ও ২০১৪ সালের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য দেখা যায়নি।

## প্রাথমিক শিক্ষায় অভিগম্যতা

সময়ের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার বেড়েছে। শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির নিট হার, প্রকৃত নিট ভর্তির হার ও সমন্বিত নিট ভর্তির হারের মাধ্যমে এই বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। ৬-১০ বছরের মোট শিশুর বিপরীতে একই বয়সের যে সংখ্যক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি আছে (তা যে শ্রেণিতেই হোক না কেন) তার অনুপাত দ্বারা নিট ভর্তির হার নির্ণয় করা হয়েছে। ৬-১০ বছরের মোট শিশুর বিপরীতে একই বয়সী যে সংখ্যক শিশু প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি রয়েছে তার অনুপাত দ্বারা প্রকৃত নিট ভর্তির হার নির্ণয় করা হয়েছে ।

স্কুলের ভর্তির প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রেই সময়ের সঙ্গে উন্নতি ঘটেছে। নিট ভর্তির হার ১৯৯৮ সালে ছিল ৭৭ শতাংশ, যা ২০১৩ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৪.৫ শতাংশ। প্রকৃত নিট ভর্তির হার ১৯৯৮ সালে ৭০.৯ শতাংশ থেকে ২০১৩ সালে ৭৮.৩ শতাংশ উন্নীত হয়েছে। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত পুরোটা সময় ধরে মেয়ে শিক্ষার্থীরা ছেলে শিক্ষার্থীদের তুলনায় এগিয়ে ছিল। যদিও ১৯৯৮ সালে এই হারগুলো শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে বেশি ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এর বিপরীত চিত্র দেখা যাচ্ছে।



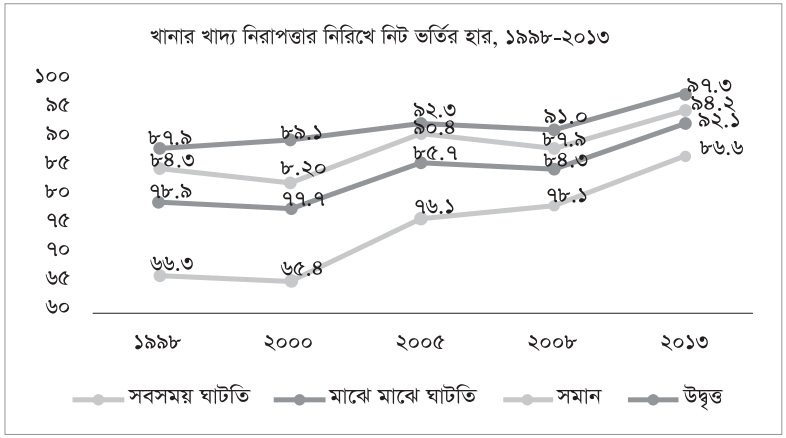


সূত্রঃ এডুকেশন ওয়াচ খানা জরিপ ১৯৯৮, ২০০০, ২০০৫, ২০০৮, ২০১৩

শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির সঙ্গে তাদের বয়স, পিতা-মাতার শিক্ষা ও পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তার সম্পর্ক রয়েছে। পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা ও পিতা-মাতার শিক্ষার ভিন্নতার সাপেক্ষে ভর্তির হারের ক্ষেত্রে আগে যতটা ব্যবধান ছিল সময়ের নিরিখে তা অনেকটা কমে এসেছে। পিতা-মাতার শিক্ষা ও পরিবারের আর্থিক অবস্থার সার্বিক উন্নতির সঙ্গে উপর্যুক্ত ব্যবধান কমার একটা সম্পর্ক রয়েছে। অবশ্য শিক্ষায় শিশুদের আকৃষ্ট করা ও বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে বিদ্যালয়গুলোর প্রচেষ্টাও এক্ষেত্রে উল্লেখ্যযোগ্য।

আইন অনুযায়ী যদিও শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির যথার্থ বয়স হচ্ছে ছয় বছর কিন্তু আগে অভিভাবকরা ৭-৮ বছর বয়সে শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতেন। কিন্তু অনেক পিতা-মাতা এখন সন্তানদের সঠিক বয়সে বিদ্যালয়ে ভর্তি করাচ্ছেন। ১৯৯৮ সালে যেখানে প্রথম শ্রেণির কেবল এক-পঞ্চমাংশ শিক্ষার্থী ছিল ছয় বছর বয়সী সেখানে ২০১৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪.২ শতাংশ। ১৯৯৮ সালে প্রথম শ্রেণির ৪৬ শতাংশ শিক্ষার্থীর বয়স ছিল ৬-৭ বছর, যা ২০১৩ সালে বেড়ে ৬৫.৪ শতাংশ দাঁড়িয়েছে। তারপরও ২০১৩ সালে প্রথম শ্রেণির এক-চতুর্থাংশ শিক্ষার্থীই ছিল আট বছর বা তার বেশি বয়সী।

ছয় বছর বয়সে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার প্রবণতা ক্রমে বাড়ছে। এটি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি নতুন ঘটনা। ১৯৯৮ সালে যখন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা তেমন পরিচিত ছিল না, তখন ৬ বছর বয়সী ১০ শতাংশ-এর ও কম শিশু প্রাক-প্রাথমিকে ভর্তি হতো। এই হার ২০১৩ সালে ৩৬.৫ শতাংশ-এ পৌঁছায়। ইতোমধ্যে সরকার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি খোলার নির্দেশ দিয়েছে।

ভর্তির হার বাড়ায় বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমেছে। ১৯৯৮ সালে ৬-১০ বছর বয়সী ৩৮ লাখ শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে ছিল। এই সংখ্যা কমে ২০০০ সালে ৩৪ লাখ ও ২০০৫ সালে ২৩ লাখ হয়, যা ২০০৮ সালেও একই ছিল। বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা ২০১৩ সালে এসে দাঁড়ায় ১০ লাখে। ১১-১৪ বছর বয়সীদের মধ্যেও বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা কমেছে। এই বয়সীদের মধ্যে ১৯৯৮-২০০০ সালে ৩৩ লাখ শিশু বিদ্যালয়-বহির্ভূত ছিল, যা ২০০৫-এ কমে দাঁড়ায় ২৬ লাখে ও ২০১৩ সালে আরও কমে দাঁড়ায় ১৮ লাখে। ২০১৩ সালে ৬-১৪ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে প্রায় ৩০ লাখ ছিল বিদ্যালয়-বহির্ভূত।

বিভিন্ন বছরে বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশুর প্রাক্কলিত সংখ্যা (লাখ), ১৯৯৮-২০১৩

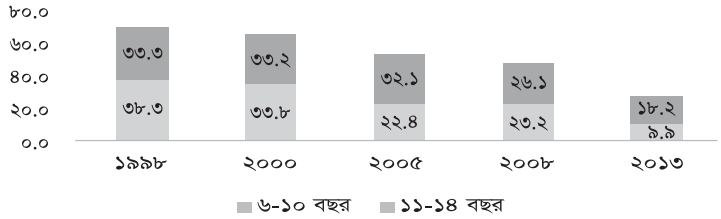


সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ খানা জরিপ ১৯৯৮, ২০০০, ২০০৫, ২০০৮, ২০১৩



## বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন প্রতিবেদন

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার বেড়েছে, ১৯৯৮ সালে এই হার ছিল ৫৮.৯ শতাংশ, যা ২০১৩ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৭৪.৫ শতাংশ। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সকল ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই হার ৫৮.১ শতাংশ থেকে ৭২.৪ শতাংশ-এ পৌঁছেছে। একই সময়ে এ হার নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫২.১ শতাংশ থেকে ৭১.২ শতাংশ, উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে ৮০.৭ শতাংশ থেকে ৮৯.৪ শতাংশ এবং এবতেদায়ি মাদ্রাসায় ৪৭.৪ শতাংশ থেকে ৬৫ শতাংশ-এ উন্নীত হয়েছে।

বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির শতকরা হার, ১৯৯৮-২০১৪

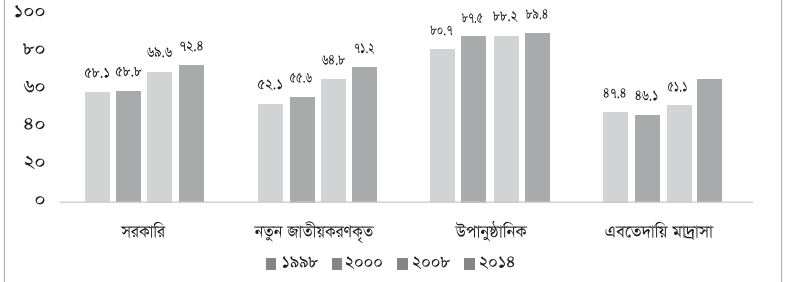


সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জরিপ ১৯৯৮, ২০০০, ২০০৮, ২০১৪

## প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ দক্ষতা

পাঁচটি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সম্মিলিতভাবে এক শ্রেণি থেকে পরের শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার হার ১৯৯৮ সালে ছিল ৮৬.৫ শতাংশ, যা ২০০০ সালে বেড়ে হয় ৮৭ শতাংশ। কিন্তু ২০০৮ সালে তা কমে ৭৭.৬ শতাংশ হওয়ার পর ২০১৪ সালে আবার বেড়ে ৯২ শতাংশ হয়। উত্তীর্ণ হওয়ার হার ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মাঝে বেশি দেখা গেছে, তবে গ্রামীণ ও শহুরে বিদ্যালয়ের মধ্যে এতে তেমন একটা পার্থক্য দেখা যায়নি।

২০১৩-২০১৪ সালের তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, যেসব শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল তাদের মধ্যে ৮৬.৮শতাংশ পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত টিকে ছিল এবং ৭৯.২ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছিল। এই তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে, প্রায় ২০ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা পূর্ণ করার আগেই ঝরে পড়েছে। ছাত্রদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারীর হার ছিল ৭২.৪ শতাংশ আর ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ৮৫.৬ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলের ৭৯.৭ শতাংশ ও শহরাঞ্চলের ৭৭.১ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছে। সরকারি প্রাথমিকে ৮৬.৩ শতাংশ, উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৮৬.৮ শতাংশ, নতুন জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৬৩.৩ শতাংশ, কিন্ডারগার্টেনের ক্ষেত্রে ৫১.৭ শতাংশ ও এবতেদায়ি মাদ্রাসার ক্ষেত্রে ৩৬.৮ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছে।



২০১৩-২০১৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষার অভ্যন্তরীণ দক্ষতার মাত্রা ছিল ৭৪.৩ শতাংশ। এটি ছাত্রদের ক্ষেত্রে ৬৯ শতাংশ ও ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ৭৯.৩ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৭৪.৮ শতাংশ ও শহরাঞ্চলের বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৭২.১ শতাংশ। বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে এটি উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৮৯.১ শতাংশ, সরকারি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৭৭.১ শতাংশ, নতুন জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৬৬.৬ শতাংশ, কিন্ডারগার্টেনের ক্ষেত্রে ৬১ শতাংশ এবং এবতেদায়ি মাদ্রাসার ক্ষেত্রে ৪৮.১ শতাংশ।

গ্রামাঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দক্ষতা শহরাঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের থেকে বেশি। অন্যদিকে নতুন জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেনের ক্ষেত্রে এর বিপরীত চিত্র দেখা গেছে। গ্রাম ও শহরাঞ্চলের উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে প্রায় একইরকম অভ্যন্তরীণ দক্ষতা দেখা গেছে।

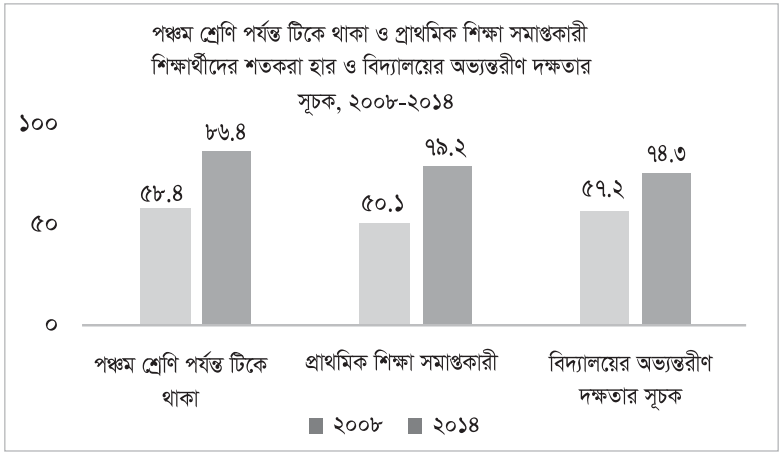


সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জরিপ ১৯৯৮, ২০১৪

## পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অর্জিত যোগ্যতা

শিক্ষাক্রমে পঞ্চম শ্রেণির উপযোগী যে প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো নির্দেশ করা আছে তার মধ্য থেকে ২৭টি বেছে নেওয়া হয়। এর মধ্যে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ২০১৪ সালে গড়ে ২০.১টি যোগ্যতা অর্জন করেছে। কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থীরা যেখানে অর্জন করেছে ২৩.৪টি যোগ্যতা, সেখানে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ২০.৪টি, উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ১৯.৯টি, নতুন জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ১৮.৩টি ও এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা ১৭.২টি প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করেছে। প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে ছাত্রীরা ছাত্রদের ছাড়িয়ে গেছে এবং শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের তুলনায় ভাল করেছে।

সময়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অর্জনের গড় বেড়েছে-২০০০ সালে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা গড়ে ১৬.১টি প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করেছিল, ২০০৮ সালে তা বেড়ে ১৮.৭টি হয়েছিল এবং ২০১৪ সালে তা আরেক দফা বেড়ে ২০.১টিতে পৌঁছায়। দেখা গেছে, ছাত্রীরা ক্রমান্বয়ে ছাত্রদের চেয়ে ভাল করছে। আবার শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের থেকে ভাল করেছে।

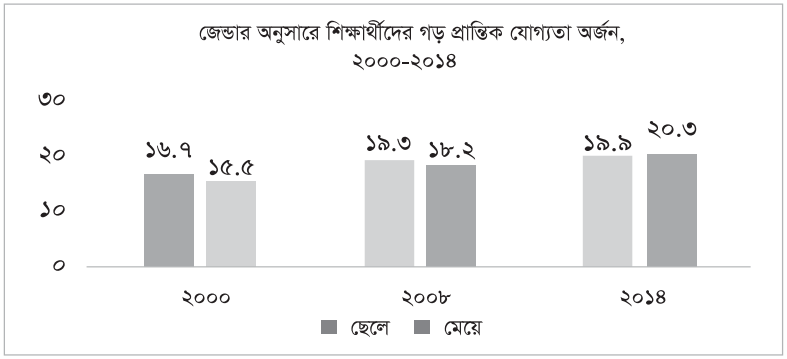


সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ প্রান্তিক যোগ্যতা পরিমাপক অভীক্ষা ২০০০, ২০০৮, ২০১৪



শিক্ষার্থীরা ২০১৪ সালে গড়ে ৭৪.৫ শতাংশ যোগ্যতা অর্জন করেছে। বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক বিজ্ঞানে অর্জন করেছে ৮৩.৩ শতাংশ যোগ্যতা, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ে ৭৮.৭ শতাংশ যোগ্যতা, বাংলায় ৭৩.৭ শতাংশ যোগ্যতা, গণিতে ৬৯.২ শতাংশ যোগ্যতা ও ইংরেজিতে ৬২ শতাংশ যোগ্যতা। প্রতিটি বিষয়েই সময়ের সঙ্গে ফলাফলে উন্নতি লক্ষ করা গেছে। গণিতের ফলাফলে উন্নতি সবচেয়ে বেশি (২১.২ শতাংশ পয়েন্ট), এরপরে ইংরেজি এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (প্রতিটিতে ১৫ শতাংশ পয়েন্টের বেশি)। বাংলা বিষয়ের ফলাফলে উন্নতি হয়েছে সবচেয়ে কম (৭ শতাংশ পয়েন্ট)। 'জ্ঞানমূলক' ও 'অনুধাবনমূলক' উভয় ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের ফলাফলে ক্রমোন্নতি লক্ষ করা গেছে। 'অনুধাবনমূলক' প্রশ্নের তুলনায় 'জ্ঞানমূলক' প্রশ্নের ক্ষেত্রে অনেক বেশি উন্নতি ঘটেছে।

## জনসাধারণের শিক্ষা ও সাক্ষরতা পরিস্থিতি

যে কোনো দেশে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত দুটি বিষয় হলো জনসাধারণের শিক্ষার স্তর ও সাক্ষরতার হারে উন্নতি। এগুলোকেও প্রাথমিক শিক্ষার তাৎক্ষণিক ফল বলা যায়। এখানে সূচক দুটির বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণও করা হয়েছে। জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতি পর্যবেক্ষণের জন্য চার ধরনের সূচক ব্যবহার করা হয়েছে। সেগুলো হলো: (১) ছয় ও তদূর্ধ্ব বয়সী জনগোষ্ঠীর স্কুলে ভর্তির হার, (২) এগারো ও তদূর্ধ্ব বয়সী জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার হার, (৩) চৌদ্দ ও তদূর্ধ্ব বয়সী জনগোষ্ঠীর নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার হার এবং (৪) ষোলো ও তদূর্ধ্ব বয়সী জনগোষ্ঠীর মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার হার। প্রতিটি সূচকেই সময়ের নিরিখে উন্নতি লক্ষ করা গেছে, যদিও পরের দুটি সূচকের তুলনায় প্রথম দুটিতে উন্নতি তুলনামূলকভাবে দ্রুততর হয়েছে।

প্রতিটি সূচকেই নারীরা পুরুষদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে রয়েছে। শহরের জনসাধারণ গ্রামের জনসাধারণের তুলনায় উপর্যুক্ত চার সূচকেই এগিয়ে রয়েছে। শহরের জনসাধারণের মধ্যে নারীরা পুরুষদের তুলনায় এই চার সূচকে যথেষ্ট উন্নতি করেছে, এমনকি গ্রামীণ নারীদের অগ্রগতি শহরের নারীদের তুলনায় বেশি। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৮ সাল থেকে ২০১৩ সালে ছেলেদের মধ্যে স্কুলে ভর্তি হওয়ার হার বেড়েছে ১৫.৬ শতাংশ পয়েন্ট আর মেয়েদের মধ্যে তা বেড়েছে ২০.৮ শতাংশ পয়েন্ট। আবার, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ১৯ শতাংশ পয়েন্ট আর শহরের জনগোষ্ঠীর মধ্যে তা ১২.৯ শতাংশ পয়েন্ট। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছে এমন জনসাধারণের হার গ্রামীণ এলাকায় বেড়েছে ১৭.৭ শতাংশ পয়েন্ট আর শহর এলাকায় বেড়েছে ১৪.১ শতাংশ পয়েন্ট।

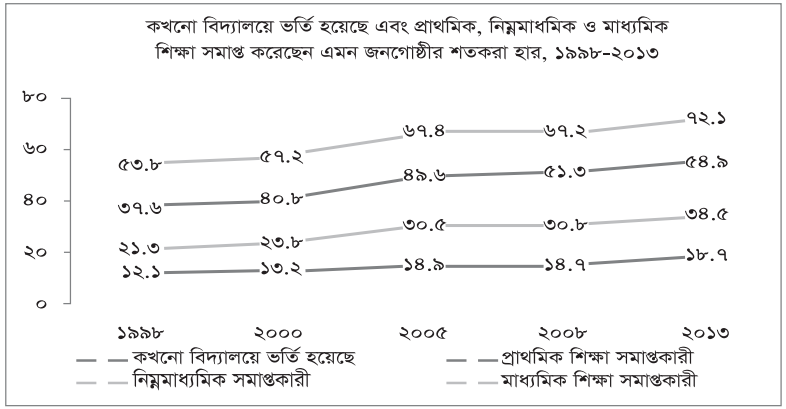


সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ খানা জরিপ, ১৯৯৮, ২০০০, ২০০৫, ২০০৮, ২০১৩

সময়ের সঙ্গে জনসাধারণের সাক্ষরতার হারও বেশ বেড়েছে। সার্বিকভাবে সাক্ষরতার হার বাড়ার পরিমাণ সাত ও তদূর্ধ্ব বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১৫.৭ শতাংশ পয়েন্ট, এগারো ও তদূর্ধ্ব বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১৫.২ শতাংশ পয়েন্ট এবং পনেরো ও তদূর্ধ্ব বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১৩.৪ শতাংশ পয়েন্ট। গত চারটি জরিপেই নারীদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরতার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি পাওয়া গেছে, কিন্তু সময়ের নিরিখে নারী-পুরুষের ব্যবধান ধীরে ধীরে কমে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, বয়স্ক সাক্ষরতার হারে নারী-পুরুষের ব্যবধান ১৯৯৮ সালে ছিল ১১.৫ শতাংশ পয়েন্ট, ২০০০ সালে ১১.২ শতাংশ পয়েন্ট, ২০০৮-এ আরও কমে ৭.১ শতাংশ পয়েন্ট ও ২০১৩ সালে ৭ শতাংশ পয়েন্ট।

একইভাবে, প্রতিটি জরিপেই শহর এলাকার জনসাধারণের সাক্ষরতার হার গ্রামীণ এলাকার জনসাধারণের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি পাওয়া গেছে। সময়ের সঙ্গে গ্রাম ও শহরের মধ্যে অসমতাও কমেছে, তবে তা জেন্ডার-অসমতার তুলনায় ধীর গতিতে কমেছে।

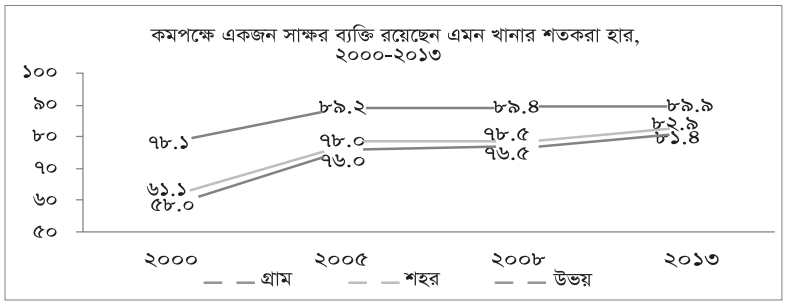


সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ খানা জরিপ ২০০০, ২০০৫, ২০০৮, ২০১৩

অন্তত একজন সাক্ষর ব্যক্তি আছেন এমন খানার (এখানে বলা হচ্ছে 'শিক্ষিত খানা') হারও সময়ের সঙ্গে বেড়েছে। ২০০০ সালে ৬১.১ শতাংশ খানায় অন্তত একজন সাক্ষর সদস্য ছিলেন; যা বেড়ে ২০০৫ সালে ৭৮ শতাংশ, ২০০৮ সালে ৭৮.৫ শতাংশ ও ২০১৩ সালে ৮২.৯ শতাংশ-এ উন্নীত হয়েছে। সাক্ষর খানার হার গ্রামীণ এলাকার তুলনায় শহর এলাকায় বেশ বেশি, যদিও এ ক্ষেত্রেও গ্রাম-শহরের পার্থক্য সময়ের সঙ্গে কমে এসেছে। অপরদিকে, সার্বিকভাবে নিরক্ষরতার হারও সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে কমে এসেছে।



প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের সর্বাধিক প্রভাব পড়েছে তরুণ জনগোষ্ঠীর (যাদের বয়স ১৫-২৪ বছর) ওপর। গত পনেরো বছরে (১৯৯৮-২০১৩) স্কুলে ভর্তি হয়েছে এমন তরুণ জনগোষ্ঠীর হার বেড়েছে ২৩.৯ শতাংশ পয়েন্ট (১৯৯৮ সালে ৬৮.৯ শতাংশ থেকে ২০১৩ সালে ৯২.৮ শতাংশ), প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছে এমন তরুণদের হার বেড়েছে ২৬.২ শতাংশ পয়েন্ট (৫৩.৩ শতাংশ থেকে ৭৯.৫ শতাংশ), নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছে এমন তরুণদের হার বেড়েছে ২২.৯ শতাংশ পয়েন্ট (৩০.৯ শতাংশ থেকে ৫৩.৮ শতাংশ) এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছে এমন তরুণদের হার বেড়েছে ১৪.৭ শতাংশ পয়েন্ট (১৪.৬ শতাংশ থেকে ২৯.৩ শতাংশ)। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে যে উন্নতি দেখা যাচ্ছে, তা শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নতির তুলনায় বেশ কম।

বয়সভিত্তিক সাক্ষরতার হারের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, প্রতিটি জরিপেই তরুণদের মধ্যে সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি ছিল। তরুণ জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার ২০০০ সালে ছিল ৬০.৪ শতাংশ, যা বেড়ে ২০০৫ সালে ৭৪.৯ শতাংশ-এ উপনীত হয়েছে এবং ২০১৩ সালে এই হার পাওয়া গেছে ৮০.২ শতাংশ। পুরো সময়কালে (২০০০-২০১৩) সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে ২০ শতাংশ পয়েন্ট।

## গবেষণার মূলবার্তাসমূহ

এডুকেশন ওয়াচ ২০১৫ প্রতিবেদনের বার্তাসমূহ সার্বিকভাবে খুবই ইতিবাচক। গত দুই দশক ধরে উন্নতির যে প্রবণতা দেখা গেছে তা অব্যাহত রয়েছে। মানসম্মত শিক্ষার তাৎক্ষণিক ফলাফল বলতে যা বোঝায় তার বেশ কিছু ক্ষেত্রে সাফল্যের মাত্রা আশাব্যঞ্জক। এডুকেশন ওয়াচ ২০১৫ গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করে যে মূলবার্তাসমূহ পাওয়া গেছে তা নিচে দেওয়া হলো।

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন আগের চেয়ে বেশি সমর্থ। সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বড় মাপের উন্নতি লক্ষ করা গেছে। সময়ের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ভৌত অবকাঠামো ও শিক্ষাসংক্রান্ত সুবিধাদি উন্নত হয়েছে; বিশেষভাবে, শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও নিরাপদ পানির সুবিধার সঙ্গে শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও উন্নতি দেখা গেছে। সবচেয়ে বেশি উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে, যেখানে দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে রয়েছে, যা উপেক্ষা করা যায় না। শৌচাগার সুবিধা না থাকা, শিক্ষকস্বল্পতা, শিক্ষার্থী-শিক্ষকের উচ্চ অনুপাত, দুই শিফটের বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত শিখনসময় এখনো দুর্ভাবনার বিষয়।

২. তাৎক্ষণিক ফলাফল নির্ণায়ক সূচকসমূহের নিরিখে সমগ্র ব্যবস্থায় লক্ষণীয় উন্নতি ঘটেছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার শেষ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের টিকে থাকা, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার প্রবণতা বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়া ও পুনরাবৃত্তির প্রবণতা কমে যাওয়া। শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনের ক্ষেত্রেও সময়ের সঙ্গে উন্নতি দেখা গেছে।



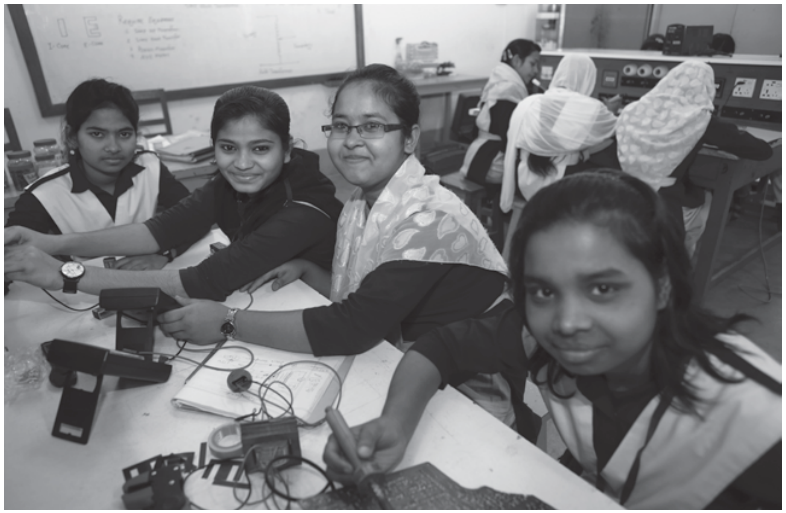

৩. শিক্ষায় অভিগম্যতা ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূর হয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষার বিবিধ ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ সার্বিকভাবে বেড়েছে। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অধিক সংখ্যায় ভর্তির বিষয়টি সুবিদিত। এ গবেষণায় শিক্ষকদের মধ্যে নারীদের অনুপাত বৃদ্ধি, বিদ্যালয় প্রধান হিসেবে তাদের অধিক হারে দায়িত্ব পালন ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে তাদের অংশগ্রহণের একটি সন্তোষজনক চিত্র ফুটে উঠেছে। পুরুষের তুলনায় অধিক সংখ্যক নারী শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অধিক সংখ্যক নারী সদস্য রয়েছেন এমন বিদ্যালয়ের অনুপাতেও ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে।

৪. কিছু নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে প্রাথমিক শিক্ষায় বৈষম্য ও অসমতা একটি দীর্ঘ দিনের সমস্যা, যা এখনো বর্তমান। বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিখনফল অর্জনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হলেও পিছিয়ে থাকা এলাকায়ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য এখনো কাটেনি। গবেষণায় দারিদ্র্যের সূচক হিসেবে 'খানার খাদ্যনিরাপত্তা ব্যবস্থা'কে বিবেচনা করা হয়েছে। দেখা গেছে, জেন্ডার, এলাকা (শহর/গ্রাম), পিতা-মাতার শিক্ষার স্তর ইত্যাদির নিরিখে প্রাথমিক শিক্ষায় যে অসমতা ছিল তা ধীরে ধীরে কমে এসেছে। বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারেও দৃশ্যমান বৈষম্য রয়েছে, যা নিরসনের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

৫. সার্বিকভাবে জনসাধারণের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সাক্ষরতা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে। প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের ভর্তি নিশ্চিতকরণ, শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের ক্ষেত্রে অব্যাহত প্রচেষ্টাসহ প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার নানামুখী পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের জনসাধারণের সামগ্রিক শিক্ষাগত সক্ষমতায় একটি ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। বিদ্যালয়ে টিকে থাকার দৈর্ঘ্য, সার্বিক সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি ও কমপক্ষে একজন সাক্ষর সদস্য রয়েছে এমন পরিবারের হারের অবস্থা দেখে বলা যায়, সাধারণ মানুষের শিক্ষাগত সক্ষমতায় বাংলাদেশের অর্জন বেড়েছে।

৬. সবার জন্য শিক্ষা ২০১৫-এর কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। এসব অসমাপ্ত কাজসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের অংশ হিসেবে ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষার যে বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জন করতে হবে তার জন্য প্রয়োজন বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থা গ্রহণ। বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ও প্রাথমিক শিক্ষা অসমাপ্ত রাখা, বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশু, সন্তোষজনক শিখনফল অর্জন এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ নিশ্চিতকরণ অসমাপ্ত কাজগুলোর মধ্যে কয়েকটি। এগুলোর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ২০৩০ সাল নাগাদ অর্জন করতে হবে এমন শিক্ষাসংক্রান্ত বৃহত্তর লক্ষ্য।

**যার মধ্যে আছে:**

- সকল শিশুকে প্রাক-শৈশব উন্নয়ন ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিখতে ও বেড়ে উঠতে সহায়তা করা;
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত উন্নীত করা;
- অধিকতর শিখনের জন্য শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করা;
- সমাজে জীবনব্যাপী শেখার সুযোগ প্রসারিত করা ইত্যাদি।

## নীতিসংক্রান্ত সুপারিশমালা

এডুকেশন ওয়াচ ২০১৫ গবেষণার ফলাফল, তথ্যের বিশ্লেষণ ও মূলবার্তাসমূহ নীতিসংক্রান্ত দিকনির্দেশনার ইঙ্গিত বহন করে। এগুলো বিবেচনায় নিয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০ বাস্তবায়নে শিক্ষাক্ষেত্রে করণীয় নীতিসংক্রান্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১. বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় এবং একই ধরনের বিদ্যালয়ের মধ্যে মানসম্পন্ন শিক্ষার জোগান ও প্রক্রিয়াসম্পর্কিত বিষয়সমূহে যে বৈষম্য বিদ্যমান, সেগুলো দূর করার প্রতি নজর দিতে হবে। বিদ্যালয়ের ধরন ও অবস্থানভেদে শিক্ষার্থীদের সমান সুযোগ প্রদান করার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও সমাজের অন্যান্য মানুষদের সহায়তা নিয়ে বিদ্যালয়গুলোর চাহিদা নিরূপণ করা যায় এবং সে মোতাবেক প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে ও শিক্ষার্থী-শিক্ষক যোগাযোগ সৃষ্টি ও শ্রেণিকক্ষকে আনন্দদায়ক করার লক্ষ্যে শ্রেণি-শিক্ষণের মান উন্নয়নের প্রতি অধিকতর জোর দিতে হবে; এর ফলে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়বে, শিখন ত্বরান্বিত হবে। শ্রেণির কার্যক্রম, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও শিখনে আরও ভাল ফলাফল পেতে শিক্ষক, অভিভাবক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের একযোগে কাজ করতে হবে।

৩. আইন অনুযায়ী যথাযথ বয়সে শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি উৎসাহিত করতে হবে; যার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষাকার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণের সংস্কৃতির উন্নয়ন ও এ ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং শিখনের অগ্রগতি নিশ্চিত করা। জন্ম নিবন্ধন, যথাযথ বয়সে বিদ্যালয়ে ভর্তির প্রচারাভিযান ও বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ কারো একার কাজ নয়। এগুলোকে বিদ্যালয়, ব্যবস্থাপনা কমিটি, পিতা-মাতা, সমাজের মানুষজন ও স্থানীয় সরকারের সম্মিলিত দায়িত্ব হিসেবে দেখতে হবে। এর ফলে একই শ্রেণিতে বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থী থাকার প্রবণতা কমে যাবে এবং শ্রেণিকক্ষে অপেক্ষাকৃত উন্নত পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্র তৈরি হবে। ফলে আনন্দময় শিখন পরিবেশ সৃষ্টি হবে। ছয় বছর বা তার বেশি বয়সে স্কুলে ভর্তি হতে আসা শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা আছে কিনা তা বিবেচনা না করে প্রথম শ্রেণিতেই ভর্তি করাতে হবে। একইভাবে ছয় বছরের কম বয়সী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতেই ভর্তি করাতে হবে।

৪. শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও যোগ্যতার বিষয়ে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে হবে অর্থাৎ তাদের 'অনুধাবনমূলক' যোগ্যতার বৃদ্ধি ও সৃজনশীলতার বিকাশকে গুরুত্বসহ বিবেচনায় রাখতে হবে। বিষয়টি বিদ্যালয়ে ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের কীভাবে মূল্যায়ন করা হয় এবং সেজন্য শিক্ষকগণ কীভাবে তাদের প্রস্তুত করেন তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। বর্তমানের পাঠ্যপুস্তকনির্ভর সুবিশাল পরিসরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা থেকে বেরিয়ে যথাযথ মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করে গ্রেড প্রদান করার চেয়েও বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন মৌলিক যোগ্যতাগুলো শিক্ষার্থীরা কতটা অর্জন করছে, কীভাবে করছে এবং এর ফলে সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় ফলদায়ক কোনো পরিবর্তন আসছে কিনা তার প্রতি নজর দেওয়া। বর্তমানে পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়, শিক্ষক ও পিতা-মাতাগণ যে ব্যস্ত সময় পার করে থাকেন সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তাদের উচিত শিখনকেন্দ্রিক বিদ্যালয় ও শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করা। প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে এ বিষয়ে তাদের উৎসাহিত করা উচিত। শুধু প্রশ্ন-উত্তর মুখস্থ করার বদলে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ভালোভাবে পড়ানোর অভ্যাস করাতে হবে। বর্তমানের শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাতকে যদি সর্বগ্রাহ্য ৩০:১ এ নামিয়ে আনতে হয় তাহলে এখনকার শিক্ষার্থী সংখ্যার সঙ্গে মিল রেখে অন্তত ৫০ শতাংশ শিক্ষক বাড়াতে হবে ।



৫. শিক্ষার গুণগত মানের ওপর জোর দিতে গিয়ে সকল শিশুর শিক্ষায় প্রবেশের অধিকার ও অংশগ্রহণের বিষয়টি থেকে মনোযোগ সরিয়ে আনা যাবে না। এখনও প্রায় ৩০ লক্ষ শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়ে গেছে। প্রতিবন্ধিতা, ভৌগোলিক অবস্থান এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় এই শিশুরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এদের কাছে শিক্ষা পৌঁছানোর জন্য বিশেষ কর্মসূচি হাতে নেওয়া দরকার। শুধু একক উপায়ে যেমন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না; তাই বহু উপায়ে এর সমাধান খুঁজতে হবে। উপবৃত্তির চেয়েও আকর্ষণীয় সহায়তা প্যাকেজসহ একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। ভর্তি না হওয়ার এবং ঝরে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে এমন শিশুদের চিহ্নিত করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ লক্ষ্যে অভিজ্ঞ এনজিওদের সঙ্গে মিলে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করতে পারে।

৬. শিক্ষার জন্য কম বরাদ্দ দেওয়ার যে প্রবণতা বর্তমানে রয়েছে, তার বিপরীতে শিক্ষায় সরকারি বরাদ্দ ব্যাপকভাবে বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রয়োজন। একই সঙ্গে বর্তমানে যে সম্পদ আছে এবং নতুন যে সম্পদ পাওয়া যাবে উভয়েরই অপেক্ষাকৃত কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। মধ্য মেয়াদে শিক্ষাক্ষেত্রে জিডিপিতে সরকারি বরাদ্দ দ্বিগুণ করাটা যৌক্তিক হবে এবং এটি সম্ভবও। পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে এই পরিমাণকে এমন একটি পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে তা যেন একটি মধ্যম আয়ের দেশের জন্য উপযুক্ত হয়। যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করার পরিকল্পনা করা হয় তাহলে মেধাবী প্রার্থীকে শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করতে ও ধরে রাখতে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়ের বড় অংশ খরচ করতে হবে উপযুক্ত ও আকর্ষণীয় সম্মানী প্রদান করার ক্ষেত্রে। বরাদ্দের একটি প্রধান অংশ রাখতে হবে অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য।

৭. সবার জন্য শিক্ষা ২০১৫-এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া ও গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন জোরদার করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে প্রয়োজন ২০৩০ সালের জন্য স্থিরকৃত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে একটি সমন্বিত জাতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। পরিবীক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সুধী সমাজ, এনজিও ও বিভিন্ন একাডেমিক ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণ চাই।

সারকথা হিসেবে বলা যায়, গত দুই দশকে উন্নয়নের যে ইতিবাচক প্রবণতা দেখা গেছে তা উৎসাহব্যঞ্জক। অনেক কিছুই করা হয়েছে, বিশেষ করে শিক্ষার তাৎক্ষণিক ফলাফল সংক্রান্ত বিষয়াদির ক্ষেত্রে। সবার জন্য শিক্ষা ২০১৫-এর অসমাপ্ত কাজ এবং ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের শিক্ষা সংক্রান্ত বৃহত্তর লক্ষ্য একই সঙ্গে আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ হিসেবে উপস্থিত। সাম্প্রতিক বছরগুলোর ইতিবাচক ফলাফল আমাদের জন্য একটি শক্তি, যার ওপর ভিত্তি করে অতি প্রয়োজনীয় শিখনফল অর্জনের ভিত স্থাপন করা এবং শিক্ষায় অংশগ্রহণের দীর্ঘদিনের যে বৈষম্য তা দূর করার পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বাংলাদেশকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন যুগের তুলনায় আরও বেশি দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে।